সতপন্থের পথে পাড়ি

রতন শিকদার

শরৎ মানে নীল আকাশে ভেসে চলা সাদা মেঘের পাহাড়। শরত মানে বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির বুকে সবুজের মেলা। শরত মানেই কাশ ফুল আর শিউলি। শরৎ মানে কৈলাশ হিমালয় হতে মা দুর্গার মর্তে আগমনের পালা। আর শরৎ মানেই আমাদের মন উচাটন, মাভৈঃ বলে হিমালয়ের পথে পাড়ি জমান। হ্যাঁ, এমনই এক অমোঘ আকর্ষণ যা কাটিয়ে ওঠা এ অধমের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাইতো বিগত কয়েক বছরের মত সেবারও তৈরি হল পরিকল্পনা। যাওয়া হবে মহাপ্রস্থানের পথ ধরে অলকানন্দার উৎসমুখ ছাড়িয়ে গাড়োয়াল হিমালয়ের পবিত্র তীর্থ সতপন্থ। চারজনের দল। আমি, ভাইয়া তপন আর ওরই দুই বন্ধু শ্যামল আর গৌতম। আমার তিন সঙ্গীই বয়সে তণ। ওদের উৎসাহে জোয়ার লাগে। শু হয় প্রস্তুতি।

পথের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানা গেল ও পথে কোন গ্রাম নেই। নেই তাই লোক চলাচল। প্রচলিত অর্থে যাকে বলে পথ তারও দেখা মিলবে না। সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে পাহাড়ি পথে স্বনির্ভর হয়ে যেতে হবে। চলেছি মহাপ্রস্থানের পথ ধরে, কিন্তু সশরীরে স্বর্গে যাবার বাসনা প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। বরঞ্চ সুস্থ শরীরে ফিরে আসতে চাই ঘরে। মাস দুয়েক ধরে তাই চলল একটা একটা করে জরি জিনিসগুলো জোগাড় করা। তবু, স্টোভ, প্রেসার কুকার, ম্যাট, স্লিপিং ব্যাগ ইত্যাদি, ইত্যাদি।
টানা একটা দিন আর দুটো রাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরের মিষ্টি আলোয় প্রথম আহ্নিকের এক সকালে হরিদ্বার পৌঁছলাম। যাবার পথে এখানে থামব না। তাই সোজা বাস স্ট্যান্ড। উদ্দেশ্য প্রথম বাস ধরে হিমালয়ের যতটা অভ্যন্তরে চলে যাওয়া যায়। স্ট্যান্ডের বাইরে রাস্তায় দাঁড়ান বাসে উঠতেই কন্ডাক্টারের বাঁশী বেজে উঠল। আমাদের যাত্রা হল শু।
গঙ্গার ওপারের পুল পেরিয়ে উত্তর দিকে বাস ছুটল। অবশ্য আসল গঙ্গা পড়ে রইল অনেক দূরে ডান দিকে। ঘন্টাখানেকের মধ্যে আবার কৃত্তিম গঙ্গাকে পেরিয়ে হৃষিকেশের বাজার এলাকায় পৌঁছে গেল বাস। শহর তখন সবে জাগতে শু করেছে। লছমন ঝুলাকে ডান হাতে ফেলে বাস চলল এগিয়ে। শু হয়ে গেল পাহাড়ি পথ। আঁকাবাঁকা চড়াই পথে বাস উঠতে লাগল পাহাড় ছাড়িয়ে আরও উঁচু পাহাড়ের মাথায়। আবার কখনও উৎরাই পথে নেমে চলা অনেকখানি।

প্রায় ঘন্টাতিনেক পথ চলা সারা। পৌঁছে গেলাম দেব প্রয়াগ। ভাগিরথী আর অলকানন্দার সঙ্গম। পবিত্র তীর্থ দেবপ্রয়াগ। তখন থেকে আমদের পথ অলকানন্দার গা ঘেষে বদ্রীনাথের দিকে। আরও ষাট কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা এক বিশাল সমতলভূমিতে প্রবেশ করলাম। এই সেই শ্রীনগর। প্রাচীন শহর, তবে এখন আধুনিক সভ্যতার পরশ লেগেছে। অফিস, কাছারি, স্কুল-কলেজ আর দোকান - বাজারে জমজমাট। একটা অই টি আই-ও আছে এখানে। ছবির মত সুন্দর বাড়িঘর রাস্তার দুপাশে। পাহাড়গুলো যেন কোনও মন্ত্রবলে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। দুপুরের খাবার গ্রহণের জন্য খানিক বিরতি এখানে। তারপর যন্ত্রযান ছুটে চলল আবার। চড়াই এর পথ। বাঁদিকে অনেক নীচে হারিয়ে গেল অলকানন্দা। আরও বত্রিশ কিলোমিটার পথ চলার পর পৌঁছে গেলাম দ্রপ্রয়াগ। প্রয়াগ মানেই দুই নদীর সঙ্গম। এখানে মন্দাকিনী এসে বিলীন হয়েছে অলকানন্দায়। পথও দুভাগ। একটি চলেছে মন্দাকিনীর হাত ধরে শিবভূমি কেদারনাথ তীর্থে। আরেকটি আমদের পথ। বদ্রীনাথ ধাম অবধি। বহুবার এপথে যেতে গিয়ে যাত্রার বিরতি ঘটেছে এখানে। তাই যেন পুরান পরিচিতের কাছে ফিরে এলাম বছর ঘুরতে না ঘুরতে।

দ্রপ্রয়াগে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটা বলছে তিনটে। পরদিন ভোরের প্রথম বাস ধরলেও এখানে কাটাতে হবে

কমপক্ষে চোদ্দ-থেকে পনের ঘন্টা। সুখের শরীর তাই ভাল একটা আস্তানা খোঁজে। দুপা এগিয়েই চোখে পড়ে গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগমের মন্দাকিনী ট্যুরিস্ট লজ। বিশাল লজ। একতলা রাস্তা থেকে নীচে, দোতলা রাস্তার সমতলে। পাহাড়ি জায়গায় সব বাড়ির যেমন চেহারা হয় আর কি। দোতলার চোদ্দ বেডের ডরমিটরিতে জায়গা মিলল মাথা পিছু অ াটচল্লিশ টাকা ভাড়ায়। সুন্দর ধবধবে সাদা বিছানা, গদি আঁটা। ঘরের লাগোয়া বাথম। লজের ঠিক নীচ দিয়েই বয়ে চলেছে অলকানন্দা তীব্রবেগে। জানালা খুলে বহমান ঐ নদীর দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

দ্রপ্রয়াগ থেকে আবার অন্য বাস ধরতে হবে। সে বাসের টিকিট যোগাড় হল গাড়োয়াল মটর ওনার্স ইউনিয়নের অফিস থেকে। সন্ধ্যা অবধি হাতে অনেক সময়। সবাই মিলে যাই দ্রনাথের মন্দির দর্শনে। মন্দির পাদদেশ থেকে সিড়ি নেমে গিয়েছে অলকানন্দার তীর অবধি। ওখানেই এসে মিশেছে মন্দাকিনি। দুই নদীর জলধারর দুই রঙ। প্রয়াগ থেকে খানিক দূরত্ব অবধি তাদের স্বাতন্ত্র রেখে চলতে চলতে তারপর একে অপরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের পর দ্রনাথের মন্দিরে অ ারতি শু হল। ঘন্টা ধবনি প্রতিধবনিত হতে লাগল সুউচচ পর্বত গাত্রে। দেবদর্শনে প্রশান্ত হল চিত্ত।
শর্মাজীর হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে যখন লজে ফিরলাম তখন আধখানা চাঁদ হাল্কা মেঘের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিচ্ছে অলকানন্দার বুকে। আমার তণ সঙ্গীদের সখ হল নদীর পাড়ে গিয়ে বসবে। নদীর পাড়ে পাথরের চাতালে বসে তার কলতান শুনতে শুনতে বাকদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। হঠাৎ একটা বিশাল কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল চাঁদট াকে। হারিয়ে গেল নদীর বুকে জ্বলা হাজার মানিক। সঙ্গীদের তাড়া দিলাম। শুতে হবে না? ভোর পাঁচটায় বাস ছেড়ে য াবে দ্রপ্রয়াগ।

ঠিক ভোর পাঁচটায় বাস এসে দাঁড়াল লজের সামনে। হাতে হাতে মালপত্র সব বাসের ছাদে তুলে দিয়ে যাত্রা শু হল। ভে ারের আঁধো অন্ধকারে হেডলাইট্ জ্বেলে বাস এগিয়ে চলল আঁকাবাঁকা পথ ধরে। মাত্র ঘন্টা তিনেকের পথ যোশীমঠ। ব াইশ কিলোমিটার যাবার পর এল কর্ণপ্রয়াগ। এপথে কেবলই প্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগে কর্ণপ্রয়াগ বা পিন্ডার গঙ্গা এবং অলক ানন্দার সঙ্গমে। বেশ ক'বছর আগে পাড়ি দিয়েছিলাম কুমায়ুনের হিমবাহ দর্শন করতে। ওই হিমবাহ থেকেই উৎপত্তি পিন্ড ার গঙ্গার। কর্ণপ্রয়াগ থেকে একটি বাস রাস্তা চলে গিয়েছে কুমায়ুনের পথে, গোয়ালদাম অবধি। তারপর গোয়ালদম থেকে কুমায়ুনের আরও অভ্যন্তরে কাপকোট, বাগেশ্বর, বৈজনাথ প্রভৃতি জায়গায়। ওই রাস্তা ডান হাতে ছেড়ে আমরা এগিয়ে চললাম চড়াই পথে। একুশ কিলোমিটার চলার পর আবার প্রয়াগ - নন্দপ্রয়াগ। এবারেও কুমায়ুন থেকে বহে অ াসা নন্দাকিনী নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে নন্দপ্রয়াগে অলকানন্দার বুকে। এই নন্দপ্রয়াগে নেমে আরও উনিশ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাট নামের এক ছোট জনপদ। ওখান থেকে পায়ে হাঁটা পথ চলে গিয়েছে অভিযাত্রীদের অন্যতম আকর্ষণ কুয়ারী গিরিপথের দিকে। কুয়ারী গিরিপথের ওপর থেকে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত তুষার পর্বত শ্রেণীর দর্শন পাওয়া যায়। অ ামরা কুয়ারী গিরিপথে পৌঁছেছিলাম অন্যপথে। থাক সে কথা। আপাতত নন্দপ্রয়াগে বাস দাঁড়িয়েছে, জলযোগটা সেরে নেওয়ার জন্য।

ক্ষণিক বিরতির পর আবার চলা শু। একের পর এক চামোলি, পিপুলকোটি, হেলং হয়ে যোশীমঠ। এই যোশীমঠে আজ য াত্রার বিরিতি। এখানে কিছু আবশ্যিক কাজ আছে। এখানে এ ডি এমের অফিস থেকে কাল সংগ্রহ করতে হবে সতপন্থের পথে চলার জন্য বিশেষ অনুমতি পত্র। সীমান্ত এলাকা, কড়া নিরাপত্তার কারণে ইনার লাইন পরমিট নেওয়া আবশ্যিক অ ামাদের মত যাত্রীদের।

বাস আমাদের আপার যোশীমঠের মুখে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল নীচের রাস্তা ধরে। নীচের এই নুতন পথ লোয়ার যে াশীমঠ হয়ে বদরীনাথের দিকে চলে গিয়েছে। যোশীমঠ বেশ জমজমাট শহর। অনেক হোটেল - লজ্ এখানে। এ পথে অনেকবার গিয়েছি, তবে রাত কাটাচ্ছি এবারই প্রথম। বিড়লা ধরমশালার কথা জানা ছিল। একটু নীচে নেমে পৌঁছে গেলাম বিড়লা ধরমশালায়। রাশভারি ম্যানেজারকে প্রয়োজনের কথা জানিয়ে থাকার ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেল। বলতে

গেলে বিনাভাড়ায়, শুধু কয়েকটা কম্বলের ভাড়া বাবদ গোটা কুড়ি টাকা দিলেই হবে।

পরদিন অফিস খুলতেই আমরা হানা দিলাম এ ডি এমের অফিসে। বাস রাস্তা ধরে দ্রপ্রয়াগের দিকে একটু হাঁটার পরই বঁ াহাতে ছোট রাস্তা উঠে গেছে এ ডি এমের অফিস অবধি। এ ডি এম সাহেবের ব্যক্তিগত সচিবটি বেশ সপ্রতিভ। আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়ে কলকাতা থেকে ডাকে পাঠান চিঠির প্রতিলিপি দেখালাম। তৎপরতার সাথে ফাইলবন্দি আমাদের চিঠি বের করে ফেললেন। তবে ওদের নির্দ্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। এক মুনশিজী আমাদের সবার জন্য হাতে লেখা ফর্ম দিলেন। আর আবশ্যক দুকপি পাশপোর্ট সাইজের ফটো। ফটোগুলো কলকাতা থেকে এ্যাটেস্টেড্ করিয়ে এনেছি। ত াছাড়া অফিসের আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য একখানি পরিচয়পত্র নিয়ে যাওয়া জরি। ওই পথে প্রতিরক্ষার কারণে বিদেশী নাগরিকদের যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা কঠিনভাবে বলবৎ হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে, এক ঘন্টার মধ্যেই আমাদের পারমিট হাতে এসে গেল।

ডেরায় ফিরে স্নান সেরে হোটেলে গিয়ে দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সম্পন্ন করে নিলাম। যোশীমঠে আমিষ নিরামিষ সব রকম খ াবারই মেলে। ইচ্ছে করলে বিকালের মধ্যে বদরীনাথ পৌঁছে যাওয়া যেত। কিন্তু যোশীমঠ ঘুরে দেখব বলে আমরা সে ব াসনা ত্যাগ করলাম। জ্যোর্তিমঠ থেকে যোশীমঠ। এখান থেকেই শঙ্করাচার্যের উত্তরধাম শু। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের চার প্রান্তে চার মঠ শঙ্করমঠ নামে প্রচলিত। উত্তরে এই জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরিমঠ, পূর্বে গোবর্ধন মঠ আর পশ্চিমে স ারদামঠ। সারা শীতকাল যখন বদরিকাশ্রম বরফে ঢাকা পড়ে থাকে তখন বদরীনাথের চলমূর্তি যোশীমঠে এনে পূজা করা হয়। সেই জ্যোর্তিমঠ আমরা দর্শন করলাম। এখানে নৃসিংহ ভগবানের কষ্টি পাথরের চতুর্ভুজ মূর্তি আছে। এছাড়াও অ াছে নবদুর্গা আর বাসুদেবের মন্দির। প্রতিটি মূর্তিই কাকলার অপূর্ব নিদর্শন।

যোশীমঠের কাছাকাছি আছে বেশ কিছু সুন্দর জায়গা। মাত্র আট কিলোমিটার দূরে আরও উঁচুতে এক অপরূপ জায়গা আউলি। এখানে শীতে স্কী খেলার আসব বসে। আউলির সবুজ প্রান্তর তখন শুভ্র তুষার ক্ষেত্রে পরিণতি হয়। ট্যুরিস্টদের সুবিধার জন্য খুব শীঘ্রই এক রোপওয়ে চালু করার কাজ জোর কদমে চলছে। (পরের বছর অর্থাৎ ৯৪ এর গোড়ায় চালু হয়ে গিয়েছে এই রোপওয়ে।) যোশীমঠ থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরত্বে সুবায়ন গ্রাম। এই গ্রাম থেকে হাঁটাপথে মাত্র তিন কিলোমিটার চড়াই ভেঙে পৌঁছান যায় আধবদরী। আর যোশীমঠের দশ কিলোমিটারের মধ্যে ধৌলিগঙ্গার পাড়ে ভবিষ্যবদরী। বদরীনাথের পথ নাকি একদিন অগম্য হবে। আর তখন এই ভবিষ্যবদরীতেই পূজিত হবেন বদরীনারায়ণ। ভবিষ্যতের কথা আপাততঃ থাক, একটু অতীতের দিকে মনটাকে ফিরান যাক। এ পথ ধরেই পৌঁছে যাওয়া যায় নীতিপাশ। আর নীতিপাশ অতিক্রম করলেই তিববত। অতীতে অনেক সাধুসন্ত এ পথেই পাড়ি দিয়েছেন কৈলাশ-মানস সরোবর দর্শনে। এ পথ এখন বন্ধ। তবে বাস চলে যায় তিববত সীমান্ত পর্যন্ত। হাতে সময় নেই, না হলে ঘুরে আসা যেত ভারতের শেষ সীমায়। যোশীমঠ থেকে অল্প দূরে ধৌলিগঙ্গার পাড়ে তপোবন। তপোবন থেকে পথ উঠে গিয়েছে কুয়ারিপাস অবধি।

হাতে সময় ছিল। তাই বাজার ঘুরে কিছু রসদ জোগাড় করে নিলাম। কেরোসিন খুঁজতে গিয়ে নাকাল। তবে মুস্কিল - অ াসান করলেন জৈন স্টোর্সের শ্রী অশোক জৈন। নিজের গৃহের সঞ্চয় থেকে আমাদের প্রায়োজন মেটালেন। ব্যবসায়ী ম ানুষ, অবসর কম। কিন্তু সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন হিমালয়ের পথে। হিমালয়প্রেমে পাগল। প্রার্থনা করলেন আম াদের যাত্রা যেন শুভ হয়। সফল যাত্রা শেষে ফেরার পথে বাস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল যোশীমঠে। দেখা করতে গিয়েও দেখা পাইনি। ব্যস্ত ব্যবসায়ী, ব্যবসারই কাজে বাইরে গিয়েছিলেন তখন।

আগের দিনই দুজন মালবাহকের সাথে কথা বলা ছিল। ভোরের আলো ফুটবার আগেই ওদের সাহায্যে মালপত্র নিয়ে নেমে গেলাম লোয়ার যোশীমঠে। আপারে বাস দাঁড়ায় অল্প সময়। ওই অল্প সময়ে মালপত্র তোলার অসুবিধা হবে। লে

ায়ার যোশীমঠে গেট। অর্থাৎ যোশীমঠ থেকে বদরীনাথ অবধি পথ একমুখী। গেটে বাস দাঁড়াবে অনেকক্ষণ। তাই হাতের কাছে বাসস্ট্যাণ্ড ছেড়েও নামতে হল অনেক নীচে। বাস এসে দাঁড়াল। ভীড়ে ভীড়াক্কার। বাসের মাথায় মালপত্র তুলে ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকে কোনওরকমে দাঁড়াবার জায়গা মিলল শুধু। গড়গড়িয়ে বাস নেমে চলল। নীচে আরও নীচে। অলকানন্দার উপর মাড়োয়ারী পুল। পুল পেরিয়ে হাঁস ফাঁস করে চড়াই ভাঙ্গতে শু করল আমাদের যন্ত্রযান। এই মাড়োয়ারী পুল থেকে যাওয়া যায় ফুলের উপত্যকা চেনাপ। সদ্য ওর পরিচয় হয়েছে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে। যোশীমঠে অশোক জৈন বলেছিল এ উপত্যকার কথা। মাইলের পর মাইল ঈশ্বরসৃষ্ট পুষ্পোদ্যান। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অশোকের চোখেমুখে শিহরণ জাগছিল। চেনাপের কথা তুলতেই গৌতম বলল, দাদা চল আমরা একবার চেনাপ ঘুরে আসি। ওর কথার কি উত্তর দেব। মনে মনে ভাবি, সারা হিমালয় জুড়েই এমন কত সুন্দর জায়গা। এক জীবনে কি আর সব দেখা সম্ভব! এবার এল বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুগঙ্গা বা অলকানন্দার সাথে মিলন হয়েছে ধৌলিগঙ্গার। বিষ্ণুপ্রয়াগ ছাড়িয়ে খানিকপথ উঠে বাস এসে দাঁড়াল গোবিন্দঘাটে। বাস প্রায় ফাঁকা করে দিয়ে বহু যাত্রী নেমে গেলেন এখানে। আমাদেরও দণ্ডায়মান অবস্থায় যাত্রার অবসান হল। অবশ্য বাস আবার নূতন যাত্রীতে ভরে গেল। যাত্রীরা বেশীর ভাগই শিখ ধর্মাবলম্বী। ওরা সব গোবিন্দঘাট থেকে ১৯ কিলোমিটার পায়ে হাঁটা পথ দূরের পবিত্র শিখতীর্থ হেমকুণ্ড সাহিব দর্শন করে ফিরছেন। এবারে চলেছেন বদরীনাথ দর্শনে। কঠিন চড়াইভাঙ্গা পথে পৌঁছাতে হয় হেমকুণ্ড সাহিব তীর্থে। ওখানে আছে এক বরফভাসা হ্রদ। হ্রদের জলে তুষারশৃঙ্গের প্রতিচ্ছবি এক নৈঃসর্গিক দৃশ্যের সৃষ্টি করে। এই গোবিন্দঘাটে নেমেই যেতে হয় ১৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ভুবনবিখ্যাত ফুলের উপত্যকা নন্দনকানন বা ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স।

বাস এগিয়ে চলল একের পর এক কঠিন বাঁক আর চড়াই অতিক্রম করে। পথে পড়ল পাণ্ডুকেশ্বর, তারপর হনুমান চটি। শ্যামল বাসের বাঁদিকে বসেছিল। হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, দেখ দেখ অলকানন্দার বুকে কতবড় একটা হিমবাহ এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওকে বুঝাই ওগুলো হিমবাহ নয়। হিমালয়ের বুকে যে হাজার হাজার ঝরণা আছে, তারা কঠিন শীতের দাপটে জমাট বেঁধে যায়। তারপর গ্রীষ্ম আসার পর বৃষ্টি নামলে কেউ আবার স্বরূপ ফিরে পায়। আবার হয় স্রোতস্বিনী। কেউ বা মুক্তি পায় না পুরোপুরি। আমরা এখন বেশ উচচতায় চলেছি। কাছে দূরে সবুজ পাহাড়ের মাথা সাদা বরফের মুকুট নজরে পড়ছে। আস্তে আস্তে কালো মেঘে ঢেকে যাচ্ছে আমাদের চারপাশ। হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি বরফের চূড়া, আবার পর মুহূর্তেই আকাশের মুখ ভার। কে যেন এক পোঁচ কালো আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে পাহাড়ের মুখে আর বুকে। শুধু পদতল টুকু দেখা যাচ্ছে বলে গাড়ি চলেছে এগিয়ে। তবে অতি ধীর তার চলার ছন্দ। ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করে বাস এসে দাঁড়াল বদরীনাথে। বেলা দশটাও বাজে নি। টিপ টিপ করে বৃষ্টি, তার সাথে সূঁচ বেঁধান হাওয়া। একটা চায়ের দোকানে মালপত্রগুলো তুললাম। শ্যামল অর গৌতম রইল ওগুলোর দায়িত্বে। আমি আর ভাইয়া চললাম মাথা গোঁজার আস্তানার খোঁজে।

কলকাতা থেকে আসবার সময় এক বন্ধু পরমর্শ দিয়েছিল বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমের আশ্রমের স্বামীজির সাথে যোগাযোগ করতে। সতপন্থের পথের জন্য বিশ্বস্ত গাইড্ আর মাল বাহকের ব্যবস্থা উনি করে দিতে পারবেন। ওখানেই আশ্রয় নেব ভেবেছিলাম। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা স্থানধারণের ক্ষমতার কয়েকগুণ। তাই ওখানে নিরাশ হয়ে পাশের শ্রীকৃষ্ণ আশ্রমে হাজির হলাম। একই পরিস্থিতি এখানেও। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ....। ওখান থেকে আরেক লজে্ । খুব একটা পছন্দ না হলেও উপায় নেই। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কোথায় ঘুরব খালি পেটে। তার ওপর দুই সঙ্গী মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। দুখানা অপ্রশস্ত ঘর, বাথরুম সংলগ্ন। ভীড় বুঝে ভাড়াও বাড়ে । দ্বিশয্যার এক - একটি একশ টাকা।

লজে উঠে গুছিয়ে বসতে না বসতেই হাজির হলেন কেয়ারটেকার গুপ্তাজি। খুব আলাপি লোক। কয়েক মুহূর্তেই জানিয়ে দিলেন ফৌজি ছিলেন। এখন অবসরের পর এই চাকরি নিয়ে বছরে ছমাস বদরীনারায়ণের পদতলে কাটিয়ে দেন। শীত আসার শুতেই চলে যান মুল্লুকে, বেনারসে। ওখানেই ওর পরিবার খেতিবাড়ি নিয়ে সারা বছর থাকে। ওর নিজের কাশীবাস মরশুমি পাখির মত ছমাস। গুপ্তাজিকে সতপন্থ যাওয়ার বাসনার কথা জানাই। সঙ্গে সঙ্গে নিৎসাহ করেন। বলেন,

উপরে আবহাওয়া অতি খারাপ। পথে বৃষ্টি, এমন কি তুষারপাতও হতে পারে। ওকে জানাই অনেকদিনের পরিকল্পনা আর প্রস্তুতির পরিণিতি আজ এখানে আসা। তাই আমাদের তো এত অল্পে হাল ছাড়লে চলবে না। তাই আরও খবর জোগাড় করা অতি অবশ্য প্রয়োজন।

দশহাজার ফুটের উচচতা, তার ওপর বৃষ্টি। বায়ুস্নানেই শরীর শীতল। প্রত্যেকেরই পেটে ক্ষিদের টান। হোটেলে খাওয়া সেরে টুরিস্ট এনকোয়ারি অফিস খুঁজে বের করি। মেঘলা অন্ধকার দিন, তার ওপর এনকোয়ারি অফিসে উপস্থিত একমাত্র কর্মচারীটি কম্বল মুড়ি দিয়ে সোফায় শুয়ে আছেন। ওকে ডেকে তুলে সতপন্থের ব্যাপারে অনুসন্ধান করি। বলেন, ওখানে গিয়ে মরবে নাকি? দেখছ না, এখানেই মৌসম কি খারাপ, ওপরে না জানি কি হচ্ছে। তবে আমরা মানাগ্রামে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারি কোনও গাইড্-মালবাহক পাওয়া যায় কিনা। ওর অমূল্য উপদেশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসি।

পথে লোকজন নেই বললেই চলে। অলকানন্দার ওপারে মন্দিরের সামনে খুব ভীড়। দলে দলে লোক চলেছে মিছিল করে বদরীনাথের ভোগমূর্তির সাথে। গুপ্তাজী জানিয়েছিলেন, আজ বামন দ্বাদশী। বদরীনারায়ণের প্রধান পূজারীর তত্ত্বাবধানে মূর্তি যাচ্ছেন মাতার দর্শনে। মাতার মন্দির এখান থেকে দুই কিলোমিটার দূরের মানাগ্রামে। মাতার পূজা হবে হোমাগ্নি জ্বেলে। আর এই উপলক্ষ্যে ওখানে বসেছে বিশেষ মেলা। মাতাপুত্রের মিলন শেষে সাঙ্গ হবে সে মেলা। মিছিলের সাথে নারায়ণ আবার ফিরে আসবেন নিজধামে। মাতার নিঃসঙ্গ অপেক্ষা চলবে আবার বছরভোর।

অফিস থেকে বেরিয়েই সামনে পড়ি এক শেতাঙ্গ যুবকের। আমাদের দাঁড় করিয়ে আলাপ করে। অষ্ট্রেলিয়া থেকে একা এসেছে ভারতভ্রমণে। নাম এল্যান হোয়াইট। এল্যানের বয়স আনুমানিক তিরিশ। ওদেশে স্কুলে পড়ায়। ওর ইংরাজি বোঝা বেশ দুষ্কর। কিছুক্ষণ আলাপচারির পর বলল ও ভারতীয় যোগীর দর্শন পেতে চায়। ও শুনেছে এখানে নাকি পাহাড়ের কোন গুহায় বসে যোগীর তপস্যা করেন। তাদের ও কাছ থেকে দর্শন করতে চায়। ওর কথা শুনে মনে পড়ে যায় সেই শিখসন্তের কথা। প্রথমবার নন্দন কানন-লোকপাল-হেমকুণ্ড দর্শন সেরে বদরীনাথে এসেছিলাম। বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমে ওঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল। শুনেছিলাম উনি নাকি সব আলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। আর তার প্রমাণপত্র হিসাবে জাহির করেছিলেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ওর সম্বন্ধে লেখালেখাগুলি। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে ওসব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমরা পাইনি। যাই হোক দুবছর পর আবার এলাম বদরীনাথধামে। দর্শন সেরে বাস ধরতে যাচ্ছি। পথে হঠাৎই দেখা সন্তজীর সাথে। নমস্কার জানাতেই চিনতে পেরে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন চলো আমার সাথে ওই পাহাড়ের মাথায়ঙ্গ এক মহাত্মা যোগীর দর্শনে যাচ্ছি। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল ওর আহ্বান, কেননা বাস ছেড়ে যাবে। টিকিট অগ্রিম কাটা ছিল। বাস ছাড়তে তখন মাত্র মিনিট পনের বাকি। এল্যানকে বলি, যোগীদশন ভাগ্যে জোটে নি। তবে সে ওই নারায়ণ পর্বতের উপরে উঠে দেখতে পারে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে তার যোগীদর্শন ঘটলেও ঘটতে পারে। ও ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যায়। ভাবি সত্যিই কি ভারতের আধ্যাত্মবাদের আকর্ষণে ও এতটা পথ ছুটে এসেছে হিমালয়ে?

অভিজ্ঞ গাইড্ লাল সিং এর কথা জানা ছিল। মানাগ্রামে ওর বাড়ি। আমরা চলেছি মানাগ্রামে। অলকানন্দার ওপারে পুল পেরিয়ে বদরীনাথের মন্দির। মন্দিরের সামনে দিয়ে পায়ে চলা পথ গিয়েছে মানা অবধি। ওপথ ধরে আমরা বেশ কিছুটা এগোবার পর দেখি নারায়ণের মূর্তি নিয়ে মাতার পূজা সেরে ফিরে আসছেন প্রধান পুরেহিত। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অগণিত ভক্ত তার সঙ্গী। ওদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাই। প্রায় সমতল পথ। নদীর ওপার দিয়ে পাকা সড়ক, মিলিটারির গাড়ি চলেছে লাইন দিয়ে। এদিকে পথের পাশে ক্ষেত। জমি থেকে আলু খুঁড়ে বের করতে ব্যস্ত পাহাড়ি সুন্দরীরা। ওরা সবাই মানাগ্রামের বাসিন্দা। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে পথ চলতি এক তণীকে জিজ্ঞেস করি লাল সিং এর কথা। পিঠে আলুর বোঝা নিয়ে পথ চলতে চলতেই ইশারায় বলে ওকে অনুসরণ করতে। নদীর ওপর ঝুলাপুল পেরিয়েই

প্রবেশ করি মানাগ্রামে। ভারত সীমান্তের শেষ জন বসতি। গলিপথ ঢুকে গেছে গ্রামের ভেতর। আমাদের পথ প্রদর্শিকা বঁ াহাতে একটা বাড়ি দেখিয়ে বলে, ওই লাল সিং এর ঘর। ওকে ধন্যবাদ জানাই। বুঝি না কি বোঝে। ওর সঙ্গিনিরা হেসে ওঠে খিল খিল করে। থামে না, দুলতে দুলতে গ্রামের পথে হারিয়ে যায়।

লাল সিং এর সাথে পরিচয় হয়। উদ্দেশ্য জানাতে বলে, চলো সাব ভেতরে বসে কথা হবে। ওকে অনুসরণ করি সবাই। ভেতর বাড়িতে উঁচু ভিতের ঘর। নীচু দরজায় মাথা বাঁচিয়ে প্রবেশ করি ঘরে। মেঝেতে বিছান কয়েকটা রাবার ম্যাটরেস্। তার ওপর আমাদের বসতে বলে নিজেও বসে একধারে। শু হয় কথাবার্তা। ওর অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র স্বরূপ ঝুলি থেকে বের করে দেয় একগাদা কাগজপত্র। বিভিন্ন দলের অভিযানে হ্যাপ বা হাই অল্টি চুড্ পোর্টার অর্থাৎ অতি উচ্চতায় ম ালবাহক হিসাবে কাজ করেছে। এই হ্যাপদের অনেক অনেক দায়িত্ব। অভিযানের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করে এদের কর্মকুশলতার উপর। সবদলের নেতারাই লালসিংএর দক্ষতার প্রশংশা করেছেন। সম্পূর্ণ পবিত্রমনে যেতে হবে ওখানে। দেবতাদের স্থান, তাই ওখানকার পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। এমন কিছু করা চলবে না যাতে দেবতাদের শান্তি বিঘ্নিত হয়। আমরা অঙ্গীকার করি পবিত্রভূমির পবিত্রতা রক্ষা করব। ঠিক হয় দুজন মালবাহক নেব আমরা। আর তাদের যোগ াড়ের দায়িত্ব গাইড্ লাল সিং এর। কথা চলতে চলতে এক গ্লাস করে চা এসে গেল সবার জন্য আর তার সাথে মাতাজীর পূজার প্রসাদ। ধন্যবাদ জানাতেই লাল সিং বলে, মাতাজীর পূজা হয়েছে আজ। সব ঘরেই প্রসাদ। তোমরা দূরদেশের অতিথি। অতিথিকে এই সামান্য আপ্যায়নের জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছ!

পারিশ্রমিক ঠিক হয় পড়াও হিসাবে। পড়াও মানে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিত্রম করতে যে দিন লাগে। সতপন্থ দর্শন করে ফিরে অ াসতে যাতায়ত নিয়ে মোট চার পড়াও অর্থাৎ চার দিন। পড়াও প্রতি লালসিং নেবে একশ দশ টাকা আর মালবাহকরা প্রত্যেকে সত্তর টাকা করে। সব তো ঠিক হল। এবার ভাইয়ার প্রশ্ন, লাল সিংজি আবহাওয়া কেমন মনে হচ্ছে? লাল সিং এর সাফ জবাব। অব মৌসম ঠিক হো জায়গা। অর্থাৎ এবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর তাছাড়া ভয়ের কি অ াছে? সত্যিই যদি আবহাওয়া তেমন খারাপ হয়, ওপরে ওঠার মত অবস্থা যদি নাই থাকে, তবে আমাদের নিরাপদে না মিয়ে আনার ষোল আনা দায়িত্বও তো তার। আমাদের আস্তানার ঠিকানা দিয়ে ফিরে চললাম। কথা হল মালবাহক দুজনকে নিয়ে সন্ধের পর লাল সিং হাজির হবে আমাদের ডেরায়।

দিনের শেষে আকাশে মেঘ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে নীলকণ্ঠের তুষার শিখর এখনও দৃষ্টির অগোচরে। কথামত সন্ধ্যা নামার ঠিক পরেই তার দুই সঙ্গী নিয়ে হাজির হল লাল সিং। প্রতাপ সিং আর কেশর সিং দুই মালবাহক সঙ্গী হবে আম াদের। তিন জনের বয়সই প্রায় ষাটের এপাশ ওপাশ। ভাঙাচোরা মুখে অভিজ্ঞতার বলিরেখা টানা। বাড়তি মালপত্র আল াদা করে গুছিয়ে আগেই কেয়ারটেকারের ঘরে তুলে দিয়েছি। মালবাহকরা যাত্রাপথের মালপত্রগুলি নিজেদের সুবিধামত বাঁধাছাঁদা করে রেখে বিদায় নিল। পরদিন সকাল ছটা নাগাদ যাত্রা শু হবে বদরীনাথ থেকে। বাইরে বেরিয়ে ওদের বিদ ায় জানিয়ে ঘরে ফিরেছি। হঠাৎ শ্যামলের চিৎকার। দাদা দেখ, স্নোপীক বেরিয়েছে। বদরীনাথ মন্দিরের পিছনেই আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠের তুষারশৃঙ্গ। দ্বাদশীর চাঁদের আলোয় এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি হয়েছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি আমরা। আশর্চ্য, আকাশে মেঘের লেশমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। ভাইয়া বলল, অব মৌসম ঠিক হো গয়া।

সকাল সাতটা বেজে যায়, তবু ওদের দেখা নেই। চিন্তা শু হয়। ঘরবার করছি, এমন সময় তিন মূর্তির দর্শন মেলে। ল ালসিং ভরসা দেয় তেমন দেরি হয় নি। মৌসম খুশ আছে, আরামসে পৌঁছে যাব লক্ষীবন। জয় বদরীবিশালজিকি জয়, জয় সতপন্থ মহারাজকি জয় বলে আওয়াজ তোলে লাল সিং। আমরাও গলা মেলাই সমস্বরে। প্রাণে ফুর্তি লাগে, আম াদের যাত্রা শু হয়। পরিচিত পথ মানা অবধি। সমতল পথে চলার কষ্ট নেই। আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাই মানাগ্রাম। গ্র ামের ভিতর পুলিশ চৌকি। যাত্রাপথের পারমিট পেশ করতে হয় এক অধিকর্তার সামনে। প্রত্যেকের ছবি মিলিয়ে ওগুলো

জমা রাখেন অফিসে। যাত্রা শেষে ওখানে আবার রিপোর্ট করতে হবে। তখন ফেরত পাওয়া যাবে পারমিট। যাত্রার অনুমতি মেলে। এবার লাল সিং তার বাড়ি থেকে একান্ত নিজস্ব কিছু জিনিস ঝুলিতে ভরে নিয়ে আসে। ওর স্ত্রীও বিদায় জানাতে বাইরে আসে। দুজনে কি কথা হয়। লালসিং আবার ভিতরে যায়। ফিরে আসে আমাদের সবার জন্য একটা করে লাঠি নিয়ে। লাঠির সাহায্যে চড়াই পথে চলতে সুবিধাই হবে। বোধহয় ওর গৃহিণীরই সুপারিশ এটা।

গ্রাম ছেড়ে আবার অলকানন্দার ঝুলাপুল পেরিয়ে পথে পাড়ি। গ্রামের অনেক লোক দাঁড়িয়ে দেখে সতপন্থ যাত্রীদের। রোদ ঝলমল দিন। আসল পথে যখন নামি তখন ঘড়িতে বাজে প্রায় সাড়ে নটা। পেছন ফিরে দেখি নীল আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কুবের ভান্ডার তুষার পর্বত। ডানদিকে আমাদের চলার পথ থেকে অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। বাঁদিকে নারায়ণ পর্বতের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে তুষারাবৃত নীলকণ্ঠ পর্বত। গ্রামের বাইরে মাতার মন্দিরে পৌঁছে যাই। গতকালের উৎসবের পর মা আবার নিঃসঙ্গ। প্রণাম করে আশীর্বাদ চেয়ে পথে নামি আবার। আলু ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পথ। আলুতোলা বন্ধ রেখে ওরা খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখে ভিনদেশের সতপন্থযাত্রীদের।

ক্ষেতের আল ধরে চলতে চলতে একসময় ক্ষেতও শেষ হয়। জনমানব শূন্য ধু ধু প্রান্তর। একটু পর লাল সিং এর নির্দেশে দাঁড়িয়ে পরি সবাই। ডানদিকে হাত তুলে দেখায়, ঐ কেশব প্রয়াগ। সরস্বতী আর অলকানন্দার সঙ্গম। সরস্বতী এখানে অন্তঃসলিলা নয়, বরঞ্চ চঞ্চলা তরঙ্গময়ী। ঐ সরস্বতীর ওপরে বিশাল এক পাথরের খন্ড দিয়ে প্রকৃতি করেছে পারাপারের সেতু। অলকানন্দার অপর পারে বসুধারার যাত্রীদের যেতে হয় ওই পুল পেরিয়ে বেশ খানিকটা বন্ধুর পথে। ওই সেতুর নাম ভীমপুল। মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময় মধ্যমপান্ডব নাকি নদী পার হবার জন্য স্থাপন করেছিলেন ওই বিশাল প্রস্তরখন্ডটি। দূর থেকে কেশব প্রয়াগ দর্শন করে এগিয়ে চলি। হঠাৎ গুলি গোলার শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠি আমরা। লাল সিং ভরসা দেয়, ও কিছু না। আমাদের সীমান্তরক্ষীরা চাঁদমারিতে অনুশীলন চালাচ্ছে। আমরা আশ্বস্ত হই।

পথ চলতে চলতে হঠাৎ নজরে পড়ে অলকানন্দার ওপারে কয়েকজন পদযাত্রীকে। তাদের সাদা গাউনের মত পোষাক, মাথায় কালো চাদরের ওড়না। ওরকম পোষাক পরিহিতা কয়েকজনকে মানা গ্রামে দেখেছিলাম। লালসিং জানায় ওরা মানা গ্রামেরই, পূজা দিতে চলেছে বসুধারায়।

পথ এখন সামান্য চড়াই। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের তেজও বেড়েছে। প্রায় এগার হাজার ফুট উচচতাতেও ঠান্ডা বোধ হচ্ছে না। উল্টে ঘামে ভিজে উঠছে জামা। এবার বোধ হয় খানিক বিশ্রামের প্রয়োজন। লালসিং কি করে যেন মনের কথা বুঝতে পারে। খানিকটা বাঁদিকে নিয়ে যায়। একটা ঝর্ণার ধারে পৌঁছে বলে, বসে আরাম করো, ফির চলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাথরের ওপরে বসি সবাই। আমাদের পিঠের ঝোলা থেকে বের করি শুকনো খাবার, বিস্কুট ইত্যাদি। সবাই ভাগ করে নি। লালসিং তার ঝোলা থেকে বের করে ঘি মাখানো টি আর আলুর সবজি। প্রত্যেকের হাতে তুলে দিয়ে বলে, ঘর থেকে নিয়ে এসেছি। নাস্তা করো, ফির চলো। ওর চোখে ধরা দেয় কেমন এক অপত্য স্নেহ। ভাইয়া হঠাৎ বলে ওঠে, প্রতাপ সিংজী, ডাববা কা অন্দর পানি লাও ঝর্ণাসে। ওর কথায় সবাই হেসে উঠি। গৌতম ফোঁড়ন কাটে, তুই বিশুদ্ধ বাংলাতেই বল। ওরা বেশ বুঝতে পারবে। ওসব অন্দর-ঠন্দর মার্কা ভাষা শুনে ঘাবড়ে যাবে। ভাইয়া একটু রেগে যায়। বলে, ওই জল খাবার বেলায় তো তুই সবার আগে আসবি। তোর জালাটা ভরতে ডাববাই লাগবে। শ্যামল চুপচাপ বসে মিটি-মিটি হাসে। ওদের ঝগড়াটা সবাই বেশ উপভোগ করি।

আবার চলা শু। পথে চড়াই, গতি তাই মন্থর। নারায়ণ পর্বতের প্রায় গা ঘেঁসে চলেছি। অলকানন্দা অনেক দূরে। তার দর্শন না পেলেও চলার ধবনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। নীলকণ্ঠ এখন হারিয়ে গেছে নারায়ণ পর্বতের আড়ালে। হঠাৎ চোখে পড়ে নদীর অপর পারে বসুধারা। এতদূর থেকে ওই জলপ্রপাতের কোনও শব্দ কানে পৌঁছায় না। প্রায় চারশ ফুট উচচতা থেকে লাফিয়ে পড়ছে সে ধারা। সূর্যের আলোর প্রতিফলনে সৃষ্টি হয়েছে এক অপরূপ শোভার। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি

খানিকক্ষণ। ডানদিকে ফিরে দেখবার চেষ্টা করি পেছনে ফেলে আসা মানা গ্রামকে। মেঘে ঢাকা কুবের ভান্ডার পর্বতের শিখর। আর সে পর্বতের পাদদেশে যেন খেলনা বাড়িঘর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানা গ্রাম। চমক ভাঙ্গে লাল সিংএর তাড়ায়, চলো চলো। এখনও বেশ খানিকটা পথ গেলে তবে মিলবে তাঁবু ফেলবার মত জায়গা। ঝোলা আবার পিঠে স্থান পায়। শু হয় পথ চলা।

কিছুটা চলার পর আমাদের পথ প্রদর্শক থেমে যায়। সামনে তাকিয়ে দেখি পথ বলে আর কিছু নেই। বিরাট এক ধবস নেমে সৃষ্টি হয়েছে গভীর খাদ। ওটা নাকি আমাদের পেরোতে হবে। মালের বোঝা নিয়ে প্রতাপ সিং আর কেশর সিং এসে হাজির হয় অকুস্থলে। ওদের তিনজনের মধ্যে একপ্রস্থ শলাপরামর্শ। ওরা দুজন পিঠের বোঝা নিয়ে তরতর করে নেমে যায় ঝুরো বালি পাথরের ঢাল বেয়ে। অবাক হয়ে দেখি ওদের পিঁপড়ের মতো চলা। প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে নেমে আবার একই ভাবে উল্টো দিকে ঢাল বেয়ে ওপরে ওঠে। একটা সমতল পাথরের উপর পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে নিমেষের মধ্যে ফিরে আসে আমাদের কাছে।

এবার আমাদের নামার পালা। প্রথমে কেশর সিং, তারপর আমি আর ভাইয়া। তারপর আবার প্রতাপ সিং, ওর পিছু পিছু গৌতম আর শ্যামল। সবার শেষে লাল সিং। লাল সিং সমানে ভরসা দিয়ে যাচ্ছে, ডরো মৎ। খালি পায়ের দিকে নজর রাখো। এক পা এক পা করে নামতে থাকি খাদের নীচের দিকে। কখনও মাটিতে পা দাবিয়ে আবার কখনও বা চার হাত-পা মাটিতে ঠেকিয়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখি। ঝুরো মাটি, এক জায়গায় পা দিয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। থামলেই মাটি ধবসে যাচ্ছে। আবার ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে থাকি। হঠাৎ আমার ডান পায়ের নীচের পাথরটা বিশ্বাসভঙ্গ করে। ওটা গড়াতে থাকে। আমার অবস্থা বেসামাল। কিছু ভাববার আগেই পিঠে হাত পড়ে, প্রতাপ সিং। বলে, কুছ নেহি হুয়া, চলো চলো। প্রায় সমতলে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ভাবি আমাদের পাহাড়ি সঙ্গীদের কথা। কি তীক্ষ্ণ নজর আমাদের নিরাপত্তার উপর। পাথরের ওপরে সবাই বসে পড়ি। খানিক বিশ্রামের প্রয়োজন বুকের ধুকপুকানিটাকে সামলে নেবার জন্য।

এপথে এতক্ষণ চলেছি, অথচ অন্য কোনও মানুষের দেখা পাইনি। হঠাৎ খাদের ওপারে চোখ পড়তে দেখি এক যুবক দাঁড়িয়ে। চেহারায় সমতলের অধিবাসীর ছাপ। তবে একা এপথে ও কোথায় চলেছে? লাল সিং বলে, ও দিওয়ানা লড়কা। ফির আজ আয়া হ্যায়। বলি, চেন নাকি? লাল সিং বলে ওর মরবার সখ হয়েছে। দুদিন আগেও ওকে একবার মানা থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। ও নাকি একাই সতপন্থ যাবে। বিহার থেকে এসেছে। কিন্তু পাকা পাহাড়িদের মতই ওর চলবার ধারা। অবলীলা ত্রমে খাদ টপকে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ক্ষণকাল বিশ্রামে শরীর ও মন সতেজ হয়। আবার চলতে শু করি। ভাবি এ কঠিন পথে চলতে কে যোগায় শক্তি, কি করে পাই অমন একাগ্রতা? এক সমতল ময়দানে এসে পৌঁছাই। কঠিন পথের পর সমতল পেয়ে মনে জাগে ফুর্তি। পথ চলার গতি বাড়ে। লাল সিং মজা করে বলে, দেখেছো, ভগবান কেমন হ্যালিপ্যাড বানিয়ে রেখেছেন। এই হ্যালিপ্যাডের শেষ মাথায় আমাদের বাংলো। বলে কি? জিজ্ঞাসা করি, তবে কি আমরা লক্ষীবন পৌঁছে গেলাম? মাথা নেড়ে বলে আমরা চামতোলি পৌঁছেছি। লক্ষীবন আরও প্রায় দু কিলোমিটার দূরে। প্রান্তরের শেষে বাংলোর রহস্য উন্মোচন হয়। প্রান্তরের প্রান্তদেশে একটি ছোট টিলা। আর ওই টিলার ওপরেই পাথরের গুহা। বেশ কজন থাকতে পারে ওই গুহার মধ্যে। গুহার সামনেই তাঁবু ফেলার জায়গা। বেলা তিনটেও বাজে নি। প্রথম দিন হিসেবে অবশ্য ভালই আসা হয়েছে। বদরীনাথ থেকে প্রায় বার কিলোমিটার। উচচতা আনুমানিক বারো হাজার ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে।

আমরা বসে বিশ্রাম করলেও লালসিং এর বিশ্রাম নেই। গুহার সামনের সমতল জায়গাটা থেকে ছোট বড় নুড়ি পাথর সরিয়ে ফেলে তাঁবু ফেলবার ব্যবস্থা করে। ওদিকে প্রতাপ সিংরা গুহার মধ্যে কাঠকুটো জ্বালিয়ে কফি বানাতে লেগে যায়। এযেন এক তলায় থাকার জায়গা আর দোতলায় রান্না ঘর। এখানে কাঠকুটো বলতে জুনিপারের ঝোপ ঝাড়। প্রকৃতির

এমনই ব্যবস্থা যে এই ঝোপঝাড় গুলো কাঁচা অবস্থাতেই জ্বলে। আমাদের আসল রান্না অবশ্য হবে স্টোভ জ্বালিয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবার হাতে কফির গেলাস। বাংলোর হাতায় গোল হয়ে বসে কফি খেতে খেতে হিমালয়ের দৃশ্য উপভোগ করা। এ যেন ফাইভ স্টার হোটেলের ব্যবস্থা। সবার কফি খাওয়া হয়ে গেলে আমরা হাত লাগাই তাঁবু টাঙ্গানোয়। ওদিকে ভাইয়া অবশ্য যায় রান্নার তদারকিতে। ওর গলা শোনা যায়, শোনোজী, পানিকা অন্দর চাউল আর ডাল মিলাও। আবার ওর বিখ্যাত হিন্দি ডায়ালগ্। গৌতম ফোঁড়ন কাটে, হ্যা, প্রতাপ সিংজি 'অন্দর সাবনে কেয়া কহা?' পানিকা অন্দর চাউল আর ডাল কা অন্দর আলু। ওর কথায় সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। লাল সিং বলে, মোটে সাব, আচ্ছা নাম দিয়া। হাঃ হাঃ অন্দরসাব্। ওদিকে অন্দরসাবও রেগে যায়। ফিরে আসে কিচেন থেকে। বলে, ভাল করতে গেলে খারাপ হয়। দেখবি খন কেমন খিচুরি বানায়।

বসুধারার মাথার ওপর দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদ ওঠে। সূর্য অস্ত গেছে নারায়ণ পর্বতের আড়ালে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন সারা শরীরে সূচ বিঁধায়। ঠাণ্ডায় হাত-পা অবশ হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করি আমরা। তাঁবুর ভেতরে যেন এয়ার কণ্ডিশন্। সম্পূর্ণ বায়ুনিরোধক। আঁধার গাঢ় হবার আগে প্রতাপ সিংরা তাঁবুর ভেতরেই আমাদের খাবার পরিবেশন করে। ভাইয়া বলে। সাবাশ প্রতাপ সিংজি। খিচুরি দাণ হয়েছে।

রাতের খাওয়ার পর আর কি কাজ। চারিদিকে এক অদ্ভুত নীরবতা। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ি। পরিশ্রান্ত শরীর। কিন্তু ঘুম আসে না। ভাবি, আত্মীয়-পরিজন সব কোথায়? প্রকৃতির সাথে এমন নিবিড় বন্ধনে বাঁধবার আর সুযোগ কবে পাব কে জানে। কত কথা, কত ভাব মনে আসে। কখন জানি না ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু এত দীর্ঘ রাত কাটিয়ে ঘুমিয়ে কাটাই কি করে? এক এক জন জেগে উঠে ঘড়ি দেখে জানায় বারটা, দেড়টা, তিনটে। এভাবে একসময় ভোর হয়। তাঁবু গুটিয়ে মালপত্র গুছিয়ে আবার পথে নামা। সামান্য চড়াই পথ। ডানদিকে কয়েকশ ফুট নীচে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। বাঁদিকে পর্বতগাত্র অনেক দূরে। আধঘন্টা পথ চলা সারা। লাল সিং জানায় আমরা লক্ষীবন পৌঁছেছি। কোনও দিন এখানে ভুর্জবৃক্ষের বন ছিল। এখন সে বন উধাও। ডানদিকে পা চালিয়ে খাদের ধারে এসে দাঁড়াই। চোখের সামনে একি দেখি? কোন দূর বরফের সাম্রাজ্য থেকে নেমে এসেছে এক হিমবাহ। আর তার জঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে এক ক্ষীণস্রোতা। অতি ক্ষীণ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই তাহলে অলকানন্দার উৎস। দূর থেকে দেখায় যেন মাতৃক্রোড়ে শীর্ণ হাত-পা ছড়ানো শিশুটি। ওর জন্মদাত্রী হিমবাহটির নাম লাল সিং জানায় ভামলুং হিমবাহ। ওই গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে সে নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। ওর ওপরেই মহাকবি কালিদাসের সেই অলকাপুরী। প্রাণভরে অলকাপুরীর মণিময় সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। কিন্তু বেশিক্ষণ বসার অবসর কোথায়? এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে যে। তাই শু হয় পথ চলা।
সুনির্দিষ্ট পথ মেলা দুষ্কর। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো বড় বড় পাথর। পথের নিশানা বলতে অপেক্ষাকৃত ছোট পাথরগুলো একটার উপর আর একটা চাপিয়ে স্তুপের আকৃতি আর তার মাথায় গোঁজা একটা কাঠি। পাথরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলা। তবে সব পাথরগুলোই নড়বড়ে। তাই কেবল পা ছুঁয়ে এগিয়ে চলা। একটু বেসামাল হলেই আছাড় খেতে হবে। প্রায় তের হাজার ফুট উচচতার এসে পৌঁছেছি। বাতাস শুষ্ক, গাছপালা তো দূরের কথা, ঝোপঝাড়ও প্রায় নেই বললেই চলে। অল্পেতেই হাঁফ ধরে। গৌতম ওর ভারি শরীরটা নিয়ে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। শ্যামল খানিক এগিয়ে। তপন গৌতমের সাথে। আমি লাল সিং এর গায়ে গায়ে ওদের মাঝামাঝি জায়গায়। পেছন ফিরে মালবাহকদের খুঁজি। ওরা সবার পেছনে। দুটো বড় পাথরের ওপরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। খানিক দাঁড়িয়ে আবার চলতে থাকি। হঠাৎ গৌতম চীৎকার করে ওঠে, ও লাল সিংজি, পানি কতদূর? গলা শুকিয়ে গেল যে। লাল সিং আমার পিঠে হাত দিয়ে ইশারা করে থামতে। চাপাস্বরে বলে, মোটেসাবকে আসতে দাও। তারপর পেছন ফিরে গলা ছেড়ে বলে, আউড় থোড়া ব্যাস্। তারপর পানধার। বহুত পানি। জী ভরে পিয়ে নিও। বলি, পানধার! সে আবার কি? ম্যাপে দেখিনি তো। লাল সিং বলে, বোসো। দুজনে পাথরের উপর বসি। লাল সিং বলে চলে তার উপাখ্যান। এ উপাখ্যান কেউ হয়ত কোথায় লেখে নি। কিন্তু বিশ্বাসে ভর করে মুখে মুখে কথিত হয়ে বছরের পর বছর চলে আসছে। পানধারেই তো অর্জুনজী তীর দিয়ে মাটি ভেদ করে সহদেবজীর জন্য পানি এনেছিলেন। ওই পানি এখনও বহে চলেছে। ভাবি, সারাটা ভারতবর্ষের জলমাটিতেই তো রাম

ায়ণ-মহাভারত ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে আছে এক অদ্ভুত বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসই তো পথ চলার শক্তি জোগায়।

খানিক এগিয়ে আবার সমতল। দুপাশে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী। হঠাৎ করে পাথরের সাম্রাজ্যে কোন ময়দানব সৃষ্টি করল এমন ময়দান! ময়দানের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা কুল কুল করে। এই তবে পানধার। বোতলের মুখে পরিষ্কার কাপড়ের ছাঁকনি লাগিয়ে জল ভরা হল। অর্জ্জুনের সৃষ্ট ঝরণার জলে আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ হল।
লম্বা প্রান্তরের শেষে আবার চড়াই শু। সাবধানী পদক্ষেপে বোল্ডারের পর পা ফেলে ফেলে চড়াই ভাঙ্গতে হয়। গতি হয় মন্থর। অল্প চলেই ক্লান্তি আসে। কিন্তু লালসিংজির কঠিন নির্দ্দেশে এখানে থামা চলবে না। আসলে আমরা চলেছি একটা মোরনের ওপর দিয়ে অর্থাৎ নীচে হিমবাহের বরফ। সূর্যের উত্তাপে নীচের বরফ গলে গিয়ে পাথরগুলির ভারসাম্যতা নষ্ট হয়েছে। তাই শরীরের ভার নিয়ে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পরে না। কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই পাথর গড়াতে শু করে। অতএব এক পা এক পা করে এগিয়েই যেতে হয়। খানিক দূরে নজরে পড়ে একটা গুহা। তবে কি চত্রতীর্থ পৌঁছে গেলাম। লাল সিং ভুল ভাঙ্গায়। চত্রতীর্থ আরও দূরে। তবে আজকের রাতের বিশ্রাম এখানেই। হবে আজকের পথ চলার অবসান। কষ্ট মুক্তির আনন্দে পায়ে বল পাই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাই গুহার মুখে। ঠিক গুহা বললে ভুল হবে। আসলে বাড়ির ঝুল বারান্দার মত অর্থাৎ ওভারহ্যাঙ। এদের ভাষায় বলে ওডিয়ার। পেছনে পাহাড়ের দেওয়াল। দুপাশে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে আড়াল সৃষ্টি করা হয়েছে। ওই গুহার সামনে খানিকটা সমতল জায়গাঙ্গ ওখানে দু-তিনটি তাঁবু ফেলা যায়। বেলা কেবল চারটে বাজে। হাতে অনেক সময়। তাড়া হুড়ার কোনও দরকার নেই। তাই বৈঠকি মেজাজে ছড়িয়ে ছিটেয়ে সবাই বসে পরি বোল্ডারের ওপরে। এক অদ্ভুত অনুভূতি। ওই নির্জন প্রান্তরে, কেবল আমরা গুটি কয় মানুষ। আমাদের সবচেয়ে নিকটে, প্রায় ছুঁয়ে ফেলা দূরত্বে নীলকণ্ঠ পর্বত। উত্তরে দিগন্তে সতপন্থ পর্বতের গায়ে বিকালের সূর্য কুসুম কুসুম রঙ ছড়াচ্ছে। গুহার পেছন দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছে একটি শীর্ণ জলস্রোত। লাল সিং বলে ওই ধারা এসেছে সতপন্থ থেকে আর মিশেছে গিয়ে অলকানন্দায়।

আসর বেশ জমে উঠেছে। হঠাৎ খেয়াল হয় কাল দেখা সেই বিহারী ছেলেটির কথা। ভাইয়া বলে, ওতো কাল আমরা যখন তাঁবু খাটাচ্ছিলাম তখনই ফিরে গেছে। মরবে নাকি ঠাণ্ডায়? লাল সিং সায় দেয় ওর কথায়। হ্যাঁ ঠিক বলেছে অন্দরসাব। জেদ করে আরও এগিয়ে গেলে ঠাণ্ডায় নির্ঘাত মারা যেত। ওর কথা বলতে গিয়ে লালসিং-এর তার নিজের ছেলের কথা মনে পড়ে। বলে, আমার বড় ছেলে ওর বয়সী। ওকে শুধাই, কি করে সে? মানায় থাকে বুঝি? দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লাল সিং বলে, ছেলেকে সে এ পেশায় আনতে চায় না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, এত পরিশ্রম করে কি আর পাওয়া যায়। ছেলে ইন্টার কলেজে পড়ছে, গুপ্তকাশীতে। ওখানে লাল সিংএর একটা বাড়ি আছে। ওটাই ওদের শীতকালীন আবাস। আরও মাসখানেক পরে অর্থাৎ অক্টোবরের শেষে সবাই চলে যাবে মানাগ্রাম ছেড়ে। সারা মানাগ্রাম তখন বরফের নীচে। শুধু সেনাবিভাগের জোয়ানরা বাঙ্কারে বসে সীমান্ত পাহাড়ায় মগ্ন থাকবে। আবার মে মাসের মাঝামাঝি যখন বরফ গলতে শু করবে, তখন সবাই ফিরে আসবে মানায়। শু হবে চাষবাস। যুগের পর যুগ এরকম যাযাবর পাখির মতই ওদের জীবনধারা বয়ে চলেছে।

আমাদের গল্পের মাঝখানে কখন যেন প্রতাপ সিং আর কেশর সিং উঠে গিয়ে গুহার মধ্যে সংসার বিছিয়ে বসেছে। ব্যাপারটা টের পাই যখন ওরা হাজির হয় গরম কফি নিয়ে। কোনও ক্লান্তি নেই আমাদের এই সঙ্গীদের। হাসিমুখে নিয়মমাফিক সব কাজ করে চলেছে সময়ের সাথে সঠিক তাল মিলিয়ে। ওদিকে খোকাবাবু মানে শ্যামল চা-কফি খায় না, তার জন্য হরলিকস্ অনতেও ভুল হয় নি ওদের। আড়ালে সূর্য অন্তর্হিত। হঠাৎ ঠাণ্ডা নামে। কফি খেয়েই ঝটপট তাঁবু খাটানোয় হাত লাগাই সবাই ওদিকে স্টোভে রাতের খিচুড়ি চেপে গিয়েছে। রক্তিম আভা সতপন্থের বরফচূড়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে। প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উচচতায় শীতের কামড় ঠাহর হচ্ছে রীতিমত। শ্যামল গেয়ে ওঠে। আর দেরি নয়, আর দেরি নয় ....। অর্থাৎ আর দেরি না করে কনকনে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে এখনই চলা যাক তাঁবুর মধ্যে। রাতের খাওয়া

সাঙ্গ হয় আঁধার নিবিড় হবার আগে। সতপন্থের পথে পাড়ি দিতে গিয়ে আর একটি দীর্ঘ রজনীর হয় সূচনা।

সবার আগে ঘুম ভাঙ্গে শ্যামলের। তাঁবুর জানালার পর্দাটা তুলে মাথাটা বাইরে বের করে উঁকি দেয় পশ্চিম দিকে। নীল কণ্ঠের চূড়ায় রঙ লেগেছে। এক এক করে সববাই তাঁবুর বাইরে আসে। ঘাসের ওপর হালকা চিনির দানার মত বরফের গুঁড়ো। পায়ের নীচে পড়ে মুড় মুড় করে ভাঙ্গে। উত্তর দিকে সতপন্থের চূড়ায় এখনও আঁধার। শ্যামলের কণ্ঠে উচচারিত হচ্ছে 'ওম জবাকুসুম সঙ্কাশং ....'। প্রত্যেকের মেজাজ আজ উচচ তারে বাঁধা। আজ দর্শন হবে বহু আকাঙ্খিত সতপন্থ তীর্থ। হ্রদের পূণ্য সলিলে অবগাহন করতে পারব কিনা জানি না, তবে চক্ষু আর হৃদয় দিয়ে আকণ্ঠ পান করব সে নৈঃস্বর্গিক দৃশ্য।
আজ আর এখন আস্তানা গোটান হবে না। জিনিসপত্র যা যেখানে আছে তেমনই থাকবে কফি বিস্কুট খেয়ে যাত্রা হয় শু। সূর্যালোকে পথ ধৌত হতে এখনও অনেক দেরি। বরফের আস্তরণ নীচে রেখে চলতে চলতে পা জমে যাবার যোগাড়। শু হয় প্রাণান্তকর চড়াই। শুধুই বোল্ডার। ওই বোল্ডারে চড়েই চড়াই ভাঙ্গতে হয়। দাঁড়লেই শরীর অবশ হয়ে যায়। আবার বিশাল মোরেন। নীলকণ্ঠের পাদদেশ হতে নেমে এসেছে। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে যাই। হঠাৎ মেঘ ডাকার মত গু গম্ভীর আওয়াজ। মাথার ওপর সুনীল আকাশের চাঁদোয়া। এ যে দেখি বিনা মেঘে বজ্রপাত। ভুল ভাঙ্গে নীলকণ্ঠের দিকে তাকাতে। হিমানী সম্প্রপাত শু হয়েছে। অবাক নয়নে দেখি প্রকৃতির এক অপরূপ খেলা। নীলকণ্ঠের শিখরদেশে যেন শু হয়েছে ধূপধূনা দিয়ে আরতী। তার সাথে ডম্বু নিনাদ। টন টন বরফের গুড়ো ছড়িয়ে পড়ছে চারিধারে। লাল সিং এর ধমকে চমক ভাঙ্গে। জলদি আগে বাড়ো। খো মত । এ্যাভালাঞ্চের বিপুল শক্তিতে পাথরের ঢল নামলে এখানে চিরতরে সমাধিস্থ হতে হবে বালি, পাথর অর বরফের নীচে। তাই এখানে দাঁড়ান একেবারে নিরাপদ নয়। দূর থেকে যে হিমানী সম্প্রপাতের মোহিনী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই হিমানী সম্প্রপাতেই মৃত্যু ঘটেছিল ছয় জাপানী পর্বত অভিযাত্রীর। কদিন পর হৃষিকেশে বসে খবরের কাগজ পড়ে জানতে পেরেছিলাম ওই ঘটনার কথা।

আস্তে আস্তে চলা শু করি আবার। বঁদিকে আবার পর্বতগাত্র। সামনের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সতপন্থ পর্বত যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। ওরই নীচে হ্রদ। ওই খানেই আমাদের যাত্রা শেষ। পূর্ণ উদ্যমে চড়াই ভাঙ্গি। লাল সিং দাঁড়িয়ে পড়ে ঠিক করে দেয় কোন জায়গা দিয়ে উঠলে আমাদের চড়াই ভাঙ্গা সহজ হবে। পথ বলে তো সত্যিই কিছু নেই এখানে। প্রতিনিয়ত এই পথে চলে ভাঙাগড়ার খেলা। আজ যেখানে পথ, কাল হয়ত সেখানেই হবে মরণফাঁদ। সবাই আজ একসাথেই চলেছি। গৌতম আর ভাইয়া শুধু কয়েক পা পিছনে। হঠাৎ গৌতমের অসহায় ডাক, দাদা আর পারছি না। আমি এখানেই বসে থাকব। তোমরা বরঞ্চ ঘুরে এসো। ওকে বোঝাই, পথ তো প্রায় শেষ। এত কষ্ট স্বীকার পর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না? বেলা তো সবে নটা। সারাটা দিন পড়ে আছে। আমরা এক পা এক পা করে চলব। ঠিক পৌঁছে যাব সবাই। ওর মনে জোর আসে। আবার চলতে শু করে। অল্প একটু চলার পর পাথরের প্রান্তর শেষ। সামনে বিশাল উঁচু এক মাটির পাহাড়। লাল সিং এর নির্দেশে খানিক বিশ্রাম নিতে সবাই বসে পড়ি ওই পাহাড়ের পদতলে। লাল সিং বলে, আমরা তো প্রায় পৌঁছেই গিয়েছি। ওই পাহাড়টা ডিঙিয়ে গেলেই সতপন্থ হ্রদ।
এতক্ষণ বিপদ সঙ্কুল পথে চলতে চলতে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি সবাই। মানুষের শরীর, বসতে পেলে শুতে চায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমাদের পিঠে আজ ঝোলা নেই। প্রতাপ সিং এর ঝোলা থেকে বের হয় বিস্কুটের প্যাকেট, আর জলের বোতল। কেশর সিং সবাইকে বিস্কুট দেয়। বিস্কুট অর জল খেয়ে যেন দেহে বল ফিরে আসে। মনে হয় এবার অনায়াসে ডিঙ্গিয়ে যাব ওই পাহাড়ের প্রাচীর। আর তার পরই হবে আমাদের চাওয়া পাওয়ার অবসান। নব উদ্যমে আবার চলা শু হয়। চড়াই-এর তীব্রতায় শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে গিয়ে অল্পেতে হাঁফ ধরে। তবে মাটির পাহাড়ের ঢালে শুকনো ঘাসের বুকে পা রেখে উঠতে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। প্রায় আধঘন্টাটাক লড়াই করে প্রাচীরের মাথায় পৌঁছে যাই। ভেবেছিলাম ওই চড়াই-এর শেষে বোধহয় হ্রদ। ভুল ভাঙ্গে যখন দেখি আবার এক বিশাল খাদ। এবার আর মাটি নয়, কেবল নুড়ি পাথর আর বালি। ঢাল বেয়ে নেমে আবার ঢাল বেয়ে ওঠা। ঢালের ভয়ঙ্করতায় বুক কাঁপে। ভাবি আরও কত কষ্ট না জানি অদৃষ্টে লেখা আছে। বুঝি লাল সিং শুধু মনের জোর বাড়াবার

জন্য মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল — ওই পাহাড় ডিঙ্গোলেই সতপন্থ হ্রদ।

সবার আগে অতি সন্তর্পনে নামতে থাকে লাল সিং। তার পেছনে, আমরা। সবার শেষে কেশর সিং আর প্রতাপ সিং। যে কোনও মূহুর্তে পা ফসকে গেলেই সমূহ বিপদ। তবে কোনও বিপদ হয় না। নিরাপদে উৎরাই-চড়াই করে পেরিয়ে আসি ওই বিপজ্জনক জায়গাটা। লাল সিংরা বসে পড়ে পাথরের উপর। আমাদের বলে খানিক বিশ্রাম করতে। আমাদের ঠিক সামনে পাথরের স্তুপের ওপর শোভা পাচ্ছে এক লাল নিশান। লাল সিং জানায় ওটা সতপন্থের নিশানা। বুঝি পথের সব বাধা অতিক্রম করে আমরা এসে পৌঁছেছি সতপন্থ মহারাজের রাজধানীতে। গৌতম বলে, লালসিংজী তাহলে আমরা সতপন্থ তীর্থে পৌঁছালাম শেষ পর্যন্ত। সবাই নারা লাগাও - সতপন্থ মহারাজজী কি জয়।

বাকি পথটুকু সাধারণ। পনেরো মিনিট চলেই আমরা পৌঁছে যাই হ্রদের কিনারায়। স্থান মাহাত্ম্য কিনা জানি না স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি সবাই। যেন কোন মন্ত্রবলে সবাই আমরা মৌনী। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুটের উচচতায় শুষ্ক নির্মল বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নি। চোখে বিস্ময়, অন্তরাত্মা ভরে ওঠে এক অব্যক্ত আনন্দে। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি পান্নাসবুজ ত্রিকোণাকার হ্রদের দিকে। লাল সিং বলে, হ্রদের তিন কোণে তিন দেবতার অধিষ্ঠান — ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। সতপন্থ নাকি শ্রেষ্ঠ দেবতার তপস্যা ক্ষেত্র। হ্রদের দিকে মুখ করে বসে পড়ি সবাই। সম্মুখে সতপন্থ, পার্বতী আর বাঁয়ে নীল কণ্ঠের তুষারাবৃত শৃঙ্গ শোভা পাচ্ছে। অজস্র ছোট ছোট জলধারা চারদিকের বরফের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে হ্রদের বুকে রসসিঞ্চন করতে। খানিক বিশ্রামের পর নেমে যাই জলের কিনারে। গণ্ডুষ ভরে তুলে নি হিমশীতল জল। চোখেমুখে আর মাথায় ছিটিয়ে এক পরম শান্তি অনুভব করি। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতির বিশালত্বের কাছে হারিয়ে যায় বাস্তবজীবনের সব অস্তিত্ব। প্রতাপ সিংরা তাড়া লাগায় পূজা শু করার। আমার ব াস্তববাদী মনে মন্ত্রতন্ত্র আসে না। শুধু ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দি হ্রদের পারে। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক মহাশক্তির কাছে আপনি মাথা নুয়ে আসে। মনে হয় এত কষ্ট, এত পথশ্রম আমার সার্থক। এ পথে না এলে সত্যিই কি বিপুলা প্রকৃতির প্রকৃত শক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটত কখনও ?
শ্যামল আর ভাইয়ার হ্রদ পরিক্রমার বাসনা হয়। অনুমান করি প্রায় এক কিলোমিটার পথ পরিক্রমায় পাড়ি দিতে হবে। গৌতম আর আমি ওদের উৎসাহ দেই। একটু পরেই ওরা ফিরে আসে। দুর্গমতার জন্য পরিক্রমার বাসনা ওদের ত্যাগ করতে হয়।
লাল সিং এর কাছ থেকে শুনি সতপন্থ মানাগ্রামবাসীদের কাছে এক পরম তীর্থ। ওদের গ্রামের কার মৃত্যু হলে তার অ াত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব এই সতপন্থেই আসে শ্রাদ্ধকর্ম সারতে। মৃতের উদ্দেশ্যে এই হ্রদের পারে পিণ্ডদানের রীতি আছে ওদের মধ্যে। এমন এক তীর্থ, কিন্তু কোন মন্দির নেই এখানে। সিমেন্ট বালুতে গাঁথা একখানা পাকা ঘর আছে এখানে। শুনি কে ানও ব্যবসায়ী এক সাধুর জন্য বানিয়েছিলেন এই ঘর। কিন্তু যিনি গৃহত্যাগী সাধু তাঁকে কি আর গৃহবন্দি করা যায় ? ওই সাধু নাকি আরও এগিয়ে স্বর্গারোহিনী পর্বতের পাদদেশে চলে গিয়েছেন তপস্যা করতে। ঘরখানা বেশ বড়, আট দশ জন রাত কাটাতে পারে এখানে। আমরা রাত কাটাবার বাসনা নিয়ে আসিনি। আমাদের তাঁবু আর সব মালপত্র রেখে এসেছি সেই চত্রতীর্থের নীচে। আজ ইচছা আছে আরও নীচে নেমে তাঁবু ফেলবার। লাল সিং তাড়া লাগায়, 'অন্দরসাব, উঠো উঠো।'

পথপ্রদর্শকের তাড়ায় উঠে পড়ি। কাল রাতে ওই গুহাতে ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পেতে হয়েছে। তাই তো নামার তাড়া যাতে অ ারও ভাল সুরক্ষিত গুহায় গিয়ে রাত কাটান যায়। ওখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সোজা বদরীনাথ। শেষ হবে এবছরের মত হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। ফিরে যাব দৈনন্দিন জীবনে। কিন্তু মনের পটে চিরতরে আঁকা থাকবে সতপন্থের স্মৃতি, লাল সিং - কেশর সিং - প্রতাপ সিং দের আন্তরিক ব্যবহার। এক অদৃশ্য টান অনুভব করব বছরভর। আবার হয়ও নতুন পথে পাড়ি দেব। শেষবারের মত হ্রদের দিকে তাকাই, হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ জানাই পবিত্র তীর্থভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীকে। তারপর পা চালাই, চড়াই-উৎরাই - উৎরাই - চড়াই।